তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ
রমাপদ চৌধুরীর পূর্বেকার ও সমসাময়িক রচনায় বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপরেখা

রমাপদ চৌধুরীর পূর্বেকার ও সমসাময়িক রচনায় বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপরেখা

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা সঞ্চারিত হয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় সুসংবদ্ধ সামাজিক শ্রেণি হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাবের পর থেকেই বাংলা উপন্যাসের সলতে পাকানোর প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত ঘটে। তবে যে-কোন আরম্ভেরই একটা ইতিহাস থাকে, প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন থাকে সলতে পাকানোর নেপথ্য ক্রিয়া। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রত্যক্ষ পূর্বসূত্রটি প্রথম পাওয়া যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭—১৮৪৮) রচনায়। 'কলিকাতা কমলালয়'(১৮২৩), 'নববাবুবিলাস'(১৮২৫), এবং 'নববিবিবিলাস'(১৮৩১) ভবানীচরণের গদ্যচর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'কলিকাতা কমলালয়' রচনায় ভবানীচরণ উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের বাঙালি সমাজের তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। তথাকথিত ভদ্র—বিত্তবান শ্রেণি, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মের বিশ্বস্ত বর্ণনায় সমৃদ্ধ 'কলিকাতা কমলালয়'। 'নববাবুবিলাস' রচনায় বিলাসী, ইন্দ্রিয়ভোগী ও দুর্নীতিপরায়ণ বাবু সমাজের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণির মানুষ পারশী ও স্বল্প ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীনধর্মে আস্থাবিহীন হয়ে ভোগসুখে দিন কাটাতেন বলে জানা যায়। 'নববিবিবিলাস' রচনাটিতেও ভ্রষ্টাচারগ্রস্ত 'বাবু' সমাজের দোষে বিবিদের অধঃপতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে জীবনকে জীবনের মতো করে ফুটিয়ে তোলার অনুজ্ঞা থেকে বাংলা সাহিত্যে যে বাঁক্ -পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, তার প্রধান প্রবণতাটি হ'ল মানবমহিমায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বাংলা সাহিত্যে নবীন কবিতার জন্মদাতা, তেমনি প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—'৮৩) ছিলেন নবীন উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। তাঁর সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮)। গ্রন্থটি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে, বাঙালির সমাজিক ও পারিবারিক জীবনের চিত্র এঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যে অভিনবত্বের সূচনা করেছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' মতিলালের জীবনেতিহাস হলেও ঠক্‌চাচা, ঠক্‌চাচী, কেরানী বাঞ্ছারাম, মাস্টার বক্রেশ্বরবাবু প্রভৃতি চরিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান। ঠকচাচা জালিয়াৎ ও ফেরেববাজ বদমায়েশ চরিত্রের মানুষ হলেও সে জীবন্ত মানুষ ও হৃদয়গ্রাহী চরিত্র। তার জীবনদর্শন একান্তই আধুনিক। তবে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনাটি আধুনিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক হিসেবে যতটুকু মূল্যবান, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তৎকালীন সমাজ-জীবনের খাঁটি পরিচয় তুলে ধরার প্রচেষ্টায়। লক্ষণীয়, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচয়িতা সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমত —

> ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতায় ও ভাগীরথীতীরবর্তী শহরতলী অঞ্চলে মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু খাঁটি খবর পাই আলালের ঘরের দুলালে, সে খবর আর কোথাও পাই না। প্যারীচাঁদ দুইচার ছত্রে সেকালের মানুষকে জীবন্ত করিয়া আঁকিয়াছেন। ...'বাবুরাম বাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায় — উদরটি গণেশের মত — কোঁচান চাদরখানি কাঁধে — এক গাল পান।' - সেকালের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের এমন মূর্তি আর পাই কোথায়। [১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাবী আমলের অবসানে কলকাতায় যে নতুন সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করে— কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০—'৭০) মহাশয় 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় (১৮৬১—'৬২) তার চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন। হুতোম নক্‌শা আঁকতে গিয়ে খালি চোখে বাইরের জগৎ পরিদর্শন করেছেন। তিনি তাঁর রচনাকে কিছুতেই আদর্শায়িত করতে চাননি। উচ্ছৃঙ্খল ও ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত অধঃপতিত জীবনের কলঙ্কিত, কদর্য দিকগুলি তিনি তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন। সেই জীবনের প্রতি তিনি সরস ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ ও বঙ্কিম কটাক্ষপাত

করেছেন। উনিশ শতকের কলকাতা, শহরতলী ও অদূরবর্তী মফঃস্বলের ভণ্ডামি, নষ্টামি, হৈ-হুল্লোড়, হুজুগ, কদাচার ও ক্লেদক্লিন্নতার রংদার চিত্র হুতোম প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। হুতোম তাঁর নক্শায় গাজন, রথযাত্রা, চড়ক, স্নানযাত্রা,দুর্গাপুজোয় কদর্য বিকৃতি, ভূত নাবানো প্রভৃতি নিয়ে বুজরুকি, ধাপ্পাবাজি ও ছদ্মনামের আড়ালে সেই সময়কার তথাকথিত বিশিষ্ট বিত্তবান ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনায় মুখ্যত যে শ্রেণি বা সমাজের মানুষদের কথা বলা হয়েছে, তাদের 'মধ্যবিত্ত' না বলে 'বাবু' বা 'ভদ্রলোক' বলাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে 'বাবু', 'ভদ্রলোক' বা 'মধ্যবিত্ত' বলতে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি-সমাজের এলাকাটিকেই বোঝায়। কিন্তু, প্রকৃত তাৎপর্যে 'বাবু' বা 'ভদ্রলোক' ভাবার্থে একই হলেও 'মধ্যবিত্ত' সামাজিক শ্রেণি পরিচয়টির নির্দেশিত এলাকাটি কিছুটা হলেও ভিন্ন। কেননা— 'মধ্যবিত্ত' কথাটির আসল উদ্দিষ্ট হ'ল সমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাসের একটি বিশিষ্ট স্তর, আর 'বাবু' বা 'ভদ্রলোক' অনেকটাই ব্যক্তির আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক মানের সূচক। ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের রচনায় তথাকথিত এই সামাজিক শ্রেণির প্রতি যে ব্যঙ্গ প্রদর্শিত হয়েছে— তা মূলত এই শ্রেণির মানুষদের সাংস্কৃতিক মান এবং মনকে উদ্দেশ করেই। তাছাড়া- 'বাবু' বা 'ভদ্রলোক' কথাটির মধ্যে বর্ণ বা বংশগৌরবের দিকটিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কিন্তু, নক্শা রচনাকারদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ-ই প্রথম সমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাসের বিশিষ্ট স্তরটিকে সচেতনভাবে 'মধ্যবিত্ত' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। আধুনিককালে সামাজিক শ্রেণি-বিন্যাসের প্রধান মানদণ্ড হ'ল — টাকা। বর্ণ বা বংশগৌরব নয়— একমাত্র টাকার জোরেই 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র রামা মুদ্দোফরাস, কেষ্টা বাগদি, পেঁচো মল্লিক, ছুঁচো শীলেরা কলকাতার কায়েত-বামুনদের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠেছেন। তবে উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে রচিত 'নক্শা' রচনার 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি— পুরনো 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি। বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে 'মধ্যবিত্ত' জীবন সমগ্রতার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে, 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির যে জীবনদর্শন একালের উপন্যাসে উঠে এসেছে, তা এই সব নক্শাজাতীয় রচনার মধ্যে অনুসন্ধান না করাই শ্রেয়। কেননা,— 'নক্শা' তো আসলে জীবনের 'নক্শা' ছাড়া আর কিছু নয়। 'নক্শা'রচনার মধ্যে জীবন সমগ্রতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় — যা আধুনিক উপন্যাসের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। তবুও, বাংলা উপন্যাসের সার্বিক আলোচনা এবং 'মধ্যবিত্ত' জীবনবোধের উৎস নির্ধারণে এই সব 'নক্শা' রচনার মূল্য অনস্বীকার্য। একালের 'মধ্যবিত্ত' সংস্কৃতি যে জন্মসূত্রে সেদিনকার 'বাবু-কালচার'-এর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত -তা কিছুতেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-'৯৪) রোমান্স প্রধান ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে রয়েছে অদূরবর্তী ইতিহাস ও সমসাময়িক বাঙালি জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো বিত্তকেন্দ্রিক শ্রেণি বা সমাজের লেখক নন। তাঁর উপন্যাসে চিরকালীন মানব-মানবীর অন্তরাত্মার প্রেম-ভালোবাসার বিচিত্র রাগিনী ফুটে উঠেছে। তিনি মানুষের শাশ্বত অন্তর্জীবনের রূপকার। তাছাড়া, বঙ্কিমের গদ্য মানুষের কর্মময় দিনযাপনের চিত্রাঙ্কনে পরাঙ্মুখ। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–"উনিশ শতকের আপিস-আদালতের কথা দূরে থাক একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্ক , কিংবা তার ঘাত-প্রতিঘাতকে বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর এড়িয়ে চলতেন। মানুষের গদ্যময় রূপ, তার কর্মিষ্ঠ চেহারা বঙ্কিমের কল্পনাকে স্পর্শ করত না ... বঙ্কিমের যুদ্ধ বর্ণনা যে পরিমাণে সার্থক, গৃহস্থালী বর্ণনা সে পরিমাণে ব্যর্থ।" [২]

বঙ্কিম সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩—'৯১) এবং রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৭—১৯০৯) উপন্যাসে সে-কালের মধ্যবিত্ত জীবনের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'(১৮৭৪) উপন্যাসে সাধারণ বাঙালির প্রতিদিনের অনুজ্জ্বল জীবনের কথা উঠে এসেছে। সুকুমার সেন

মহাশয় জানিয়েছেন — '' ইহার পূর্বে 'আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজন-বৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর কাহিনী' কেহ লিখে নাই।" [৩] লেখকের 'হরিষে বিষাদ'(১৮৮৭) এবং 'অদৃষ্ট'(১৮৯২) উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যেও যথাক্রমে গ্রাম্য চক্রান্তের নিতান্ত স্বাভাবিক ছবি ও সাংসারিক মনোমালিন্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। রমেশচন্দ্র দত্ত মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা। কিন্তু তিনি 'সংসার'(১৮৮৬) ও 'সমাজ'(১৮৯৩) নামে দুটি সামাজিক উপন্যাসও রচনা করেছেন। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্রের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেও 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসদ্বয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যদিও শরৎচন্দ্রের মতো পল্লীসমাজের গভীর স্তরে প্রবেশের ক্ষমতা রমেশচন্দ্রের ছিল না, তবুও সমালোচক স্বীকার করে নিয়েছেন যে —

> সংসার' ও 'সমাজ'-এ রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল হইতে শান্ত পল্লীর সৌন্দর্যের মধ্যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি নূতন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এতদিন ইতিহাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সমাজ ও পরিবারের ক্ষুদ্র ব্যাপার লক্ষ্য করিতে তিনি অবসর পান নাই। কিন্তু তাঁহার শেষ উপন্যাসদ্বয়ে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের বিশাল ও সমাজের সংকীর্ণ, এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার তুল্য অধিকার ও সমান শক্তি আছে। [৪]

সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে ধরা পড়েছে — '' শেষ পর্যন্ত 'সংসার' ও 'সমাজ' কেরিয়ারমুখী বাঙালী যুবকের কাহিনীই হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'গ্রামে থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই'— এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও নয়, সামন্তকাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও নয়। সরল চাকুরি-প্রাণ মধ্যবিত্তের সহজ স্বীকারোক্তি।"[৫]

রবীন্দ্রোপন্যাসে সমাজনীতির তুলনায় মানুষের ব্যক্তিত্বের সমস্যাই বড় হয়ে উঠেছে। সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার মহাশয় জানিয়েছেন —

> রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আধুনিকতা কোথায় তা নির্ণয় করতে গেলে আগে চোখে পড়ে তাঁর উপন্যাস ঘটনা-প্রধান নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো। তাঁর উপন্যাসের প্রধান সমস্যা, সমাজনীতির নয়, মানুষের ব্যক্তিত্বের। উপন্যাসে যখন ঘটনা ঘটে, তখন সেইসব ঘটনার উৎস মানুষের ব্যক্তিত্বের রহস্যের মধ্যে নিহিত। আর এই কারণেই বঙ্কিমী-উপন্যাসের প্লট প্রধান্য ধীরে ধীরে খসিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ক্রমেই হয়ে উঠেছে থীম-প্রধান। [৬]

রবীন্দ্রোপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক আরও জানিয়েছেন যে —

> আধুনিক মনের লক্ষণ যাঁরা বিচার করেছেন, তাঁরা মোটামুটি একমত যে, আত্মসচেতনতাই আধুনিক মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবতাবাদ থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম; ঐতিহাসিক কারণে মানুষের ব্যক্তিসত্তা যতই সমাজাতিরিক্ত বা সমাজবিরোধী হয়ে উঠেছে ততই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মসচেতনতার প্রগতি। এই আত্মসচেতনতাবোধ রবীন্দ্র-উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা।[৭]

তবে, আমরা— আলোচ্য প্রসঙ্গের পর্যালোচনায় অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র অন্বেষণের মধ্য দিয়ে যেভাবে অগ্রসর হতে চাই— সেখানে রবীন্দ্রোপন্যাসের আলোচনা অনেকটাই বাহ্য। এ বিষয়ে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য —

> রবীন্দ্র উপন্যাসের বাস্তবতা পদাতিক নয়, ধুলোমাটির নয়, কিঞ্চিৎ অভিজাত, তাহলে হয়তো খুব ভুল হবে না। রবীন্দ্র-পরবতী উপন্যাসের বাস্তবতা আরো অনেক আটপৌরে ধরণের বাস্তবতা। রবীন্দ্র-পরবর্তী উপন্যাসের বাস্তবতা অনেক বিস্তৃত, অনেক খোলামেলা এবং অনেক কুণ্ঠাহীন। যেটা বিশেষ লক্ষণীয়, অনেক ঘরোয়া। বলা যায়, তা সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সন্নিকটের ... রবীন্দ্র-উপন্যাসের বাস্তবতা থেকে তা তত্ত্বগতভাবেই পৃথক। এই পার্থক্যের পেছনে জীবনবোধেরও কিছু ফারাক আছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বাস্তবতা,-

ছোটগল্পের কথা বলছি না,- উপন্যাসের বাস্তবতা সচ্ছল, শালীন, সুখী, উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা, আর পরবর্তীদের উপন্যাসের বাস্তবতা অসচ্ছল, সতত-প্রতিহত, বিক্ষুব্ধ, আত্মকরুণাপরায়ণ নিম্নমধ্যবিত্তের অথবা নিম্নমুখী বা নিম্নগামী মধ্যবিত্তের বাস্তবতা। এইখানেই রবীন্দ্র-পরবর্তী উপন্যাসের বিশেষ ধরণের আধুনিকতার পাদপীঠ।[৮]

তাছাড়াও আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে কবিতায়,গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে - সর্বত্রই চিরকালীন মনুষ্যত্বের পূজারী; সত্য,শিব ও সুন্দরের উপাসক। তাই তাঁর উপন্যাসে নির্দিষ্ট 'বিত্ত'-পরিচয়কেন্দ্রিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, স্বপ্ন, সাফল্য, ব্যর্থতা, হতাশা প্রভৃতি বিষয়ের কাহিনী অনুপস্থিত।

মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী প্রত্যয়ের তুলনায় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬—১৯৩৮) মানবপ্রত্যয় অনেক বাস্তব ঘেঁষা। শরৎচন্দ্রের 'বাস্তব' সাধারণ মানুষদের নিয়ে, বঞ্চিত মানুষদের প্রতি তাঁর গভীর মমতা। বাঙালির গৃহ ও পরিবার জীবন শরৎচন্দ্রের অপার মমতার বিষয়। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য বিষয় — "বাঙালী পরিবারের ক্ষুদ্র বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতেরই কাহিনী।" [৯] ব্রহ্মদেশে বসবাস করবার সময় শরৎচন্দ্র যখন বঙ্গ-সাহিত্যসাধনা শুরু করলেন, তখন তিনি এমন কতকগুলি গল্প-উপন্যাস রচনা করলেন, যেগুলি তৎকালের পাঠক ও সমালোচকদের অশেষ তৃপ্তি প্রদান করেছিল। যেমন— 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ বৌ','পরিণীতা','পণ্ডিতমশাই', 'মেজদিদি' ইত্যাদি। এই গল্প-উপন্যাসগুলিতে তিনি বাঙালির পারিবারিক জীবনের স্নেহমাধুর্য অতিশয় স্নিগ্ধ ও করুণ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের মূল প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন — " একান্নবর্তী পরিবারই তাঁর বেশিরভাগ কাহিনীর মূল প্রসঙ্গ। এই একান্নবর্তী পরিবার স্বার্থপরতায় কীভাবে ভেঙে পড়তে চায়, অন্যের স্বার্থত্যাগে কীভাবে ভাঙনের হাত থেকে যৌথ পরিবার বেঁচে যায়, সেই কথাই নানাভাবে বলেছেন তিনি।"[১০] শরৎচন্দ্র সমকাল সচেতন, সে-কালের ঐতিহাসিক পটভূমি-পরিস্থিতির রূপকটিও তাঁর লেখায় স্পষ্ট। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

> শরৎচন্দ্র যখন 'বড়দিদি', 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি' লিখছেন তখন আমাদের সকল চিত্ত একান্ত স্বদেশী সামগ্রীর জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। লক্ষণীয় শরৎচন্দ্রের প্রধান নায়কদের মধ্যে কেউ বড় চাকুরে নেই, সিভিলিয়ান নেই, অনেকেই ভূমিভিত্তিক উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক, সম্পত্তিভাগ ইত্যাদি সমস্যার বাইরে তাদের পৌরুষ অস্পষ্ট। ...শরৎচন্দ্রকে যে বাঙালী পাঠক জয়মাল্য দিয়েছে তার অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, তিনি বাঙালী মধ্যবিত্তের যে অংশে ছিল ক্ষুদিরাম-কানাই, 'পথের দাবী' ছাড়া তাকে সযত্নে পরিহার করলেন। আর এক অংশে ছিল ম্লান অস্তিত্বটুকু মমতায় ঢেকে রাখার আকাঙ্ক্ষা—এটাকেই শরৎচন্দ্র পরিচর্যা করলেন আত্মীয়ের আবেগে। ... তিনি যখন একান্নবর্তী পরিবারের সংকটকে ব্যবহার করতে গেছেন, তখন সেই সংকটের তটভূমিকে স্পর্শ মাত্র করে তিনি অপূর্ব মমতায় আবার সযত্ন শুশ্রূষা করেছেন। 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি' অথবা 'রামের সুমতি' যেখানেই হোক না কেন একান্নবর্তী পরিবারের পার্টিশন শেষপর্যন্ত স্থগিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রুখে দিয়েছে যে মধ্যবিত্ত, তার অভিমানে তখন খাঁটি বাঙ্গালীত্বের প্রশ্রয় প্রভূত। তারাও তো বিদেশী শক্তির প্রশাসক কৌশলের উদ্দিষ্ট পার্টিশন রুখে দিয়েছে। অশ্রুগলিত আনন্দে মধ্যবিত্তেরা এ-সব ক্ষেত্রে জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে।[১১]

শরৎচন্দ্রের মধ্যে প্রভূত সম্ভাবনা ছিল বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার হয়ে ওঠার। কিন্তু, সেই সম্ভাবনাকে তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। একদিকে জমিদারী ব্যবস্থা, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা — প্রভৃতি সব বিষয়েই শরৎচন্দ্রের পক্ষপাত ছিল সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রতি, আর অন্যদিকে, ক্ষেত্রবিশেষে তিনি আবদ্ধ রইলেন নিম্ন-মধ্যবিত্তের এলাকাটির মধ্যে। বস্তুত, বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির পারিবারিক সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার প্রথার ভাঙন। প্রকৃতপক্ষে পরিবার যৌথ থাকে কতকগুলি আদর্শের তাগিদে। তবে, যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারে স্বাধীনতা কম —যে স্বাধীনতা বিশ

শতকীয় বাঙালি মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের মূলমন্ত্র। একদিকে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের অন্তরায় হওয়ার কারণে এবং অন্যদিকে, কতকগুলি 'ইকনমিক ফ্যাক্টর'-এর কারণে একান্নবর্তী পরিবার ক্রমশ ভেঙে যেতে থাকে। কিন্তু, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এই লক্ষণটি বুঝতেই চাননি। এ বিষয়ে সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধেয় —

> নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে নতুন শিক্ষা ও জীবনবোধের বিরোধ থেকে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের শুরু, এটা শরৎচন্দ্র বুঝতে পারেননি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্থির নির্দিষ্ট জীবনের প্যাটার্নের বিপরীতে এই পরিবর্তন যে সামাজিক গতিশীলতার সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক ভাবনার মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক হয়, এই ধারণা শরৎচন্দ্রের ছিল না। অর্থনৈতিক কারণে, বুর্জোয়া ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়েছে, আর তাতে বাঞ্ছিতভাবে ঘটছে ব্যক্তির উন্মেষ। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের এই উন্মেষের মধ্যে শরৎচন্দ্র শুধুই দেখেন অবাঞ্ছিত স্বার্থপরতা। [১২]

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে বাঙালির পরিবার জীবনের এই অবাঞ্ছিত স্বার্থপরতা থেকেই এসেছে ভ্রাতৃবিরোধ (যেমন — 'নিষ্কৃতি', 'মামলার ফল', 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি), দাম্পত্য বিরোধ (বিরাজ বৌ)। যাইহোক, শরৎচন্দ্র নতুন যুগের লক্ষণটি ঠিকমতো ধরতে পারেননি বলেই শেষ পর্যন্ত রামের মতো চরিত্রদের সুমতি ফিরিয়ে দিয়ে (রামের সুমতি) একান্নবর্তী পরিবার প্রথাটিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শরৎচন্দ্র একান্নবর্তী পরিবার প্রথাটিকে টিকিয়ে রাখতে চাইলেও, বর্তমান সময়ে কিন্তু এই প্রথা কালের নিয়মেই অতীতের ইতিহাস হতে চলেছে। শরৎচন্দ্র নতুন কালের লক্ষণটিকে আয়ত্ত করতে চাইলে তিনি হয়ে উঠতে পারতেন বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তাছাড়াও আরেকটি বিষয় লক্ষিত হয়েছে যে — " শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সেইসব আধুনিক শিক্ষিত মানুষই মহৎ যারা সনাতন মূল্যবোধকে মেনে নিয়েছে— যেমন 'চরিত্রহীনে'র উপেন্দ্র, 'বিপ্রদাসে'র দ্বিজদাস, 'শেষপ্রশ্নে'র আশুবাবু।"[১৩] নারীর বন্ধনমুক্তি বা তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকটিও শরৎচন্দ্রের কাছে হিন্দুর পুনর্বিবাহ ও স্বামীসংস্কারের প্রশ্ন হিসেবেই দেখা দিয়েছে। কালের পরিবর্তনে মূল্যবোধেরও যে পরিবর্তন ঘটে, এক কালের আদর্শ যে পরবর্তীকালে অবিচল থাকতে পারেনা এবং তা থেকেই ব্যক্তির সমাজ ও পারিবারিক জীবনে দেখা দেয় মূল্যবোধে সঙ্কট—সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই বিশেষ দিকটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা ফুটে উঠতে দেখা যায় নি।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে সব নানামুখী আধুনিকতার সঞ্চার ঘটেছে, তার মধ্যে অন্যতম নরনারীর যৌন বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ঢেউ এসে স্পর্শ করল বাংলা সাহিত্যকেও —যা শরৎচন্দ্রের মতো লেখকদের কাছে ছিল কল্পনাতীত। বয়েসে কল্লোলীয়দের থেকে প্রবীণ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) ও জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) গল্প-উপন্যাসে এই বিদ্রোহের রূপ অত্যন্ত স্পষ্টতা লাভ করেছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকার, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কথা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে এতকাল ধরে যৌনতাকে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সাহায্যে আড়াল করেই রাখা হ'ত। ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, যৌনতার সর্বাতিশায়ী প্রভাবের স্বীকৃতি না দিলে মানব-জীবনের একটা বিশেষ দিক অস্বীকার করা হয়। লেখকের 'শুভা'(১৯২০), 'রক্তের ঋণ'(১৯২২), 'শাস্তি'(১৯৩২), 'পাপের ছাপ'(১৯৩২) প্রভৃতি উপন্যাসে এই বিশিষ্ট ভাবধারাটির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লক্ষ করা গেছে। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর মধ্যে ব্যতিক্রমী 'রবীন মাস্টার'(১৯৩৬)। স্কুলের থার্ড মাস্টার রবীন মার্কসীয় সাম্যবাদী ধারণায় বিশ্বাসী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা, ভূমিবন্টন ব্যবস্থা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, পল্লীর উন্নয়ন পরিকল্পনা করেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির সোস্যালিস্ট পুনর্বিন্যাস বিষয়ে লেখালেখি করেন। রবীন মাস্টারের জীবনাদর্শের প্রভাব সেকালের শ্রেণিগত মানুষের জীবনে কতটা

সক্রিয় প্রভাব ফেলতে পেরেছিল—এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া না গেলেও, তাঁর জীবন ও জীবনাদর্শ সমকালের প্রেক্ষিতে অবশ্যই একটা বড় প্রাপ্তি।

'কল্লোল' দলের বর্ষীয়ান্ সদস্য জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে রয়েছে এক 'ভবিতব্য-ভারাতুর নির্লিপ্ত উদাসীনতা।'[১৪] তিনি সচ্ছল, গৃহসুখী, ন্যায়পরায়ন মধ্যবিত্তের জীবনদর্শন সামনে রেখে উপন্যাস রচনা করেননি। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

> শঠতা, অপরাধ, বঞ্চনা, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা—জীবনের এই সব জটিল কুটিল অন্ধকার দিকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। জীবনের কল্যাণময়তায় তিনি আস্থাহীন, মানুষের মহত্ত্বে তাঁর অবিশ্বাস। বরং নিয়তির নিষ্ঠুরতাতেই যেন তাঁর বেশি বিশ্বাস। বঞ্চনা বেদনা দীর্ঘশ্বাসই তাঁর কাছে মানবভাগ্য। ...তারই মাঝখানে আছে কোনো কোনো দুর্ভাগা মানুষের সৎ হবার, মহৎ হবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।[১৫]

গল্প-উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত 'নিঃসঙ্গ নিঃসম্পর্কিত প্রাতিস্বিক "[১৬] মানুষের কথাই বলেছেন, যে-মানুষ তাঁর কর্মফলকে মুছে ফেলে স্বাধীন ও শুদ্ধতার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে চায়, — উত্তম, নটবর, কিশোরীর জীবনকে ছোট করে দেখেননি, তবুও উপন্যাসে তাদের পরাভব পাঠকচিত্তকে বেদনায় আপ্লুত করে। নরেশচন্দ্রের মতোই জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসেও আমরা পাই যৌনতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালির সমাজজীবনে একের পর এক দুর্যোগের ঝড় বয়ে গেছে। উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত জীবনবোধ 'Plain living and high thinking' এর শতাব্দীব্যাপী স্বর্ণশীর্ষ জীবন সাধনার ধারা চোরাবালির মতোই মধ্যবিত্ত বাঙালির পায়ের তলা থেকে ক্রমশই সরে যেতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা,দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের কারণে আদর্শের উচ্চ কোটি থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনদৃষ্টির স্খলন ঘটে। ইংরেজের কেরানি-করা শিক্ষা-ব্যবস্থা বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মানুষদের সামান্য কেরানির চাকুরি থেকেও বঞ্চিত করতে চাইল। বাংলার মস্তিষ্ক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর পর্বে বিপর্যয় ও সেই সূত্রে অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ল। অন্তরের শূন্যতা বা শুষ্কতা বৃদ্ধি পেল। দেখা দিল মানবীয় মূল্যবোধে বিপর্যয়। সার্বিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রায় বিলুপ্তির পথে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে, ২য় বর্ষ, 'কল্লোল' পত্রিকায় স্পষ্টত লেখা হয়েছে —

> মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক-সাধারণকে লইয়া যে সকল গল্পের অবতারণা করা হয় তাহা আজকালকার দিনে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। আজকাল 'মধ্যবিত্ত' বলিয়া কোনও অবস্থার লোক আছে বলিয়া মনে হয় না। হয় খুব বড়লোক, নয় ত একেবারে সব মিলাইয়া একদল,তাহাদের একমাত্র নাম হইতে পারে 'শ্রমিক'। [১৭]

পত্রিকাটির ৫ম বর্ষ, দশম সংখ্যায় (১৩৩৪ ব.) লেখা হয়েছে – " মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির যে কি দুরবস্থা তাহা যাঁহারা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। এমন অবস্থা আসিয়াছে, একমাত্র পুরুষের সামান্য উপার্জনে আর একটি পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য ও বস্ত্র যোগাড় হইয়া ওঠে না।" [১৮] 'কল্লোল' পত্রিকার এই তথ্যানুযায়ী, বিশ শতকের দ্বিতীয়- তৃতীয় দশকে মধ্যবিত্তের ক্রমিক বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির সমাজ জীবনে দেখা দিয়েছে উচ্চবিত্তের ক্রমিক স্ফীতি —যাদের সহায়তা করেছে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্য। যন্ত্রচালিত শিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে উৎপাদন ক্রমশ স্বল্প সংখ্যক ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। শিল্পপতি ও বণিকেরা যত পুষ্ট হতে থাকে, ততই সমাজের অন্য অংশ দরিদ্র হয়ে যেতে থাকে। যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রসারের ফলে আধুনিক সমাজে শুধু দুটি শ্রেণিই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে—মালিক ও শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্র, উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। পরিবর্তিত এই সমাজ কাঠামোয় 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকেরা সংকল্প করেছিলেন সাহিত্যে বাস্তবতার সীমাকে সম্প্রসারণ করে সমাজের অবজ্ঞাত অংশ,নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনকে তুলে ধরতে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যে নরেশচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে 'কল্লোল'-এর পূর্বসূত্রটি নিহিত রয়েছে। জগদীশ গুপ্তের

রচনাতেও অল্প পরিমাণে অ-কল্লোলীয় বিশেষত্ব থাকলেও, তাঁকে 'কল্লোলীয়' বলেই ধরা হয়ে থাকে। 'কল্লোলীয়' বাস্তবতার দায় থেকেই তিনি তাঁর উপন্যাসে পথ-চলার অনেকটা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন। 'কল্লোল'-এর শিল্পী-সংখ্যা অগণিত। দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪—১৯২৫) ছিলেন আমৃত্যু সহযোগী। শৈলজানন্দও ছিলেন একেবারে প্রথম থেকেই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু তারাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর— এঁদের সকলেরই উদীয়মান রচনা-ভাবনা ধরা পড়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। তবে, তারাশঙ্করের দু'একটি লেখা 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও,তাঁর মনের তরী কখনই ভেড়েনি 'কল্লোলে'র ঘাটে।প্রধানত মানসিকতার পার্থক্য আন্তরিক ছিল বলেই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি 'কল্লোলে'র সঙ্গছাড়া হয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর 'কল্লোলে'র ইশারায় দূর থেকে চকিত হলেও,কাছে এসে কোনদিনই ধরা দেননি। প্রবোধ সান্যালেরও চলার পথ কিছুদিনের মধ্যেই স্বতন্ত্র হয়ে যায়। কালগত বিচারে প্রেমেন্দ্র মিত্রও মূলত 'কল্লোলে'র শিল্পী নন, এই পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বেই তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখক। যাই হোক, কোন্ কথাসাহিত্যিক কোন্ পত্রিকার সঙ্গে কতদিন যুক্ত ছিলেন — এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। 'কল্লোল' প্রবণতা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য বিষয় এই যে, এই পত্রিকা যেহেতু সমকালে 'মধ্যবিত্ত বাঙালি .. .সমাজে'র বাস্তব অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিগ্ধ ছিল, সেহেতু এই পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে যাঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন, তাঁদের রচনায় দু'একটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি থাকলেও তাঁরা মূলত নিম্নগত মধ্যবিত্ত ও সমাজের নীচুতলার মানুষের জীবনচর্যাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'কল্লোল'গোষ্ঠী ঘনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত লেখকদের দৃষ্টি যে ভাবালুতায় অসহনীয় বস্তিবিলাসে পরিণত হয়েছিল— একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। তবে, জীবনদৃষ্টি ও জীবনবোধের বিস্তার ঘটেছে বলে বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোলে'র অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তথাকথিত দরিদ্র, অপাংক্তেয়, অবজ্ঞাত মানুষদের একটা বড় অংশ যে 'উপন্যাসে উপেক্ষিত' হয়ে থাকেনি (শরৎচন্দ্রের কথা স্মরণে রেখেও)— 'কল্লোলে'র দৌলতে তা সত্যিই একটা বড় প্রাপ্তি।

'কল্লোল' যখন 'মধ্যবিত্ত'-র অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিগ্ধ , উনিশ শতকীয় সচ্ছল মধ্যবিত্তের 'গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ'-এর সচ্ছলতা বা আর্থিক সঙ্গতি কিংবা এসবের সংস্থান না থাকলেও অন্তত মোটা চালের ভাতের সংস্থান —বাঙালি মধ্যবিত্তের সচ্ছল জীবনচিত্র যখন প্রায় অতীতের ইতিহাস হতে বসেছে, সেই প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- এই ত্রয়ী বাঙালি মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের ভাষ্য ও বেঁচে থাকার তাৎপর্য তিন রকমভাবে সন্ধান করতে লাগলেন তাঁদের উপন্যাসে। কিন্তু, একথা ঠিক যে, বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ী তিন রকমভাবে জীবনের তাৎপর্য সন্ধান করতে চাইলেও, একটি বিষয়ে এঁদের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে — এঁদের তিনজনেরই উপন্যাসে একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল একটি বোধ, যার মূল কথা হ'ল 'সঙ্কট'। তারাশঙ্কর তুলে ধরলেন একটা শ্রেণির সঙ্কট, বিভূতিভূষণ অনুভূতির আর মানিক ব্যক্তির সঙ্কট কিংবা জীবন জটিলতা। ইতিহাস, প্রকৃতি ও সমাজবোধ— ক্রমান্বয়ে এই তিনজন লেখকের উপন্যাসের সঙ্কটচিত্র রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

> নগর-জীবনের ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের চাকুরীগত নিরাপত্তার অভাব, যা ত্রিশের আর্থিক সঙ্কটে প্রথম উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করল—এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা ও পর্বতের মুষিকপ্রসব ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙালী মধ্যবিত্ত-জীবন তখনও আশাহীন হয়নি। বরঞ্চ এতদ্বিধ অবস্থায় চিন্তার বিভিন্ন স্তরের সক্রিয়তায় বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ তখন বিশ্বাস এবং আশার মূল জাতীয় জীবনের গভীরে মেলে দিতে চেয়েছে। শশী, অপু অথবা শিবনাথ কিংবা শঙ্কর,প্রত্যেকেই পরস্পরের থেকে দূরে হলেও এদের সমস্যার একটা সাধারণ উৎস বিদ্যমান ছিল। জীবন সম্পর্কিত আশা বা আদর্শকে রূপায়িত করতে পারা-না- পারার ব্যাপারটাই এদের

জীবনের মুখ্য ব্যাপার। অপুর শিশুচিত্তে সুদূরের আহ্বান, অথবা শশীর নগর-স্বপ্নের সঙ্গে গাওদিয়ার সংঘর্ষ কিংবা শিবনাথের ধরিত্রীকে চেনার বাসনা জীবন সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ। [১৯]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) জন্মেছেন জমিদার বংশে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সনাতনধর্ম ও রীতিনীতি, দেশাচারের প্রতি এক প্রবল পিছুটান, এক গভীর মমত্ববোধ সবসসময় তিনি অনুভব করলেও জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে—কালের পরিবর্তন তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। পারেননি বলেই তিনি 'দ্বন্দ্বের শিল্পী, দ্বন্দ্বের শিকার।'[২০] তারাশঙ্কর বেছে নিয়েছিলেন রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবনপট। একদিকে রানীগঞ্জ এবং বরাকরের কয়লাখনি শিল্পাঞ্চলের নতুন ব্যবসায়ী —যারা জমিদারী সম্পত্তি বেচে দিয়ে কয়লার ব্যবসায় নেমেছেন, আর অপরদিকে—ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশ, এদের মধ্যেকার সামাজিক, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বাস্তবচিত্র তারাশঙ্করের উপন্যাসের একটি অন্যতম প্রধান বিষয়। তারাশঙ্করের গল্প, উপন্যাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই চোখে পড়ে যে, তাঁর কথাসাহিত্য যেমন বিষয়বস্তুগতভাবে বিচিত্র, তেমনি সেখানে ভিড় করে আছে নানা বৃত্তি, নানা পেশা, নানা সামাজিক শ্রেণির মানুষেরা। 'পাষাণপুরী', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদবতা', 'মন্বন্তর', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'ঝড় ও ঝরাপাতা', 'সংকেত','শুকসারী কথা'—প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি সমকালীন ও কিছুটা অতীতের রাজনৈতিক পটভূমি ও উপাদান ব্যবহার করেছেন। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবনের রূপ ও রস প্রকাশিত হয়েছে একাধিক উপন্যাসে। যেমন — 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'রাইকমল', 'কালিন্দী', 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি। অন্ত্যজ এবং নানা পেশার মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের মানুষের পাশাপাশি কতকগুলি 'এথনিক' গোষ্ঠীর যৌথ জীবনের চিত্র রচনারও পথিকৃত তারাশঙ্কর। গ্রামীণ 'এলিট'-দের সম্বন্ধে, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো সম্বন্ধে তারাশঙ্করের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল সুগভীর ও তীক্ষ্ণ। তারাশঙ্কর যে সময়ে 'গণদেবতা' (১৯৪০) রচনা করেছেন, তখনও গ্রামীণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি - শ্রেণি হিসেবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। লেখক এই উপন্যাসটিতে প্রথম ছিরু পালের শ্রীহরি ঘোষে রূপান্তরের কথা বলে গ্রামীণ মানুষের নবার্জিত শ্রেণি চরিত্রে উন্নীত হবার কথা প্রকাশ করলেন। এই উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'(১৯২০) উপন্যাসের গোলক চাটুজ্যে গরু চালানের ব্যবসায় টাকা খাটানো ঠিক হবে কিনা— এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তার দু'দশক পরে তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'য় দেখা গেল— আলিপুরের রহমৎ স্যাক (শেখ) আর কঙ্কণার রমন্দ চাটুজ্যে-এই দু'জন একসঙ্গে মিলিত হয়ে 'ভাগাড়' দখল করেছেন 'চামড়ার' ব্যবসা করবেন বলে। বর্ণ বা বংশগৌরব নয়, সর্বশক্তিমান 'মুদ্রা'-ই যে সামাজিক শ্রেণি গঠনের প্রধান অবলম্বন, নতুন কালের এই বিশেষ চরিত্রগত দিকটি প্রকাশ করে তারাশঙ্কর বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে তাঁর নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধরেছেন। 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৫) উপন্যাসে দেখি সীতারাম 'পণ্ডিত' হয়েছেন বর্ণ বা বংশের আভিজাত্য নিয়ে নয়, তিনি ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছেন। তিনি গ্রামে একটি পাঠশালা বসানোর জন্য অব্রাহ্মণ জ্যোতিষ সাহাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর মধ্যবিত্ত অভিমানকেও প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সদ্‌গোপ শিক্ষক মশাইকে দেখে 'বাবু'দের ছেলেরা নমস্কার করলে তা হয়ে ওঠে একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভিমান ও অনুপ্রেরণা। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের কথা উঠে এলেও একথা ঠিক যে, তিনি তাঁর আজীবন সাহিত্যসাধনায় কোনো একটি নির্দিষ্ট বিত্তকেন্দ্রিক মানুষের জীবনচিত্র রচনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি; সময়ের বিস্তৃত পটভূমিতে বহু মানুষের জীবনকথা রচনার পথিকৃত তিনি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০) স্বতন্ত্র ধারার ঔপন্যাসিক। যদিও তাঁর উপন্যাসে পরিবেশিত

গ্রামীণ গার্হস্থ্য জীবনের গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। কিন্তু 'প্রকৃতি'কে উপাদান হিসেবে গ্রহণ ও 'প্রকৃতি'র অন্তহীন রহস্যের উপলব্ধি বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে হয়ে উঠেছে একটি আধুনিক বিষয়। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি দুই ভিন্ন রূপে প্রতিভাত— 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃতি — পল্লীপ্রকৃতি, আর 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি— অরণ্যপ্রকৃতি। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা একই সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং অনুভূতিসাপেক্ষ। লক্ষণীয়, 'আরণ্যক' উপন্যাসে সত্যচরণের উপলব্ধি —

> দিক্‌চক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর মানুষজন, পাখীর ডাক,বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই। [২১]

উদ্ধৃতাংশে প্রকৃতিজগতের যে-সব উপাদানের কথা বলা হয়েছে—তার কোনোটিই অপরিচিত নয়। তবুও প্রকৃতির এই রূপ 'অদ্ভুত'– যা এক গভীর শান্তি ও আনন্দ এনে দিয়েছে কথক সত্যচরণের মনের গভীরে। এই সত্যচরণই যখন প্রথম আরণ্য প্রকৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন কিন্তু প্রকৃতি তাঁকে এত আনন্দ দিতে পারেনি— " বাংলাদেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি, এই অরণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।"[২২] শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহুরে যুবক সত্যচরণ ক্রমশ আপন অনুভূতির গভীরতা দিয়েই আরণ্য প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে নিলেন। প্রশ্ন হল— বিভূতিভূষণের এই প্রকৃতিচেতনা কি সমকালের জীবনজটিলতার জগৎ থেকে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের পশ্চাদপসরণ?. আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের কাছে এই প্রকৃতিচেতনার পাঠ কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক? — এ বিষয়ে সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য আমাদের বিবেচনায় যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয় —

> বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতিচেতনার বিশেষ ভূমিকা তাঁর জীবনবিমুখ পলাতক মনের পশ্চাদপসরণ নয়, তা বস্তুত নিগূঢ় আধুনিক জীবনবোধেরই পরিচায়ক। কারণ যখন দেখি যে, অস্থির যৌবনের বিদ্রোহ ও মার্ক্স-ফ্রয়েডীয় উগ্র পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শনের আঘাতে খন্ডিত আত্মার তীব্র সংশয় ও অবিশ্বাস বাস্তব জীবনের গভীরে প্রবেশ করে তার অন্তর্গূঢ় স্বরূপ চিনে নিতে পারছে না, তখন বিভূতিভূষণের শান্ত নির্জন প্রকৃতিচেতনাকে —যা আধুনিক মানুষকে সমস্ত গ্লানি, হতাশা ও অবিশ্বাস থেকে রক্ষা করে গভীর জীবনরসের উৎসপথে নিয়ে যায়— আধুনিক জীবননিষ্ঠ ও যুগলক্ষণের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত বলে মেনে নিতে আমাদের দ্বিধার কোন কারণ থাকে না। বস্তুত জীবনকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির সাহচর্য কামনা করেননি। বরং জীবনকে আরও গভীর , আরও সত্যরূপ অনুভব করার জন্যই তার সান্নিধ্য চেয়েছেন।[২৩]

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) কবি, গল্পকার, সিনেমা গল্পের লেখক হিসেবে যতটা খ্যাতিমান, ঔপন্যাসিক হিসেবে ততটা নন। তবে তাঁর লেখা দু'একটি উপন্যাস অবশ্যই উল্লেখ করবার মতো।১৩৩০ বঙ্গাব্দে নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা অবলম্বনে রচিত 'শুধু কেরাণী' ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে কথাসাহিত্যের জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'পাঁক' উপন্যাসটি বস্তিজীবনের নগ্ন রূঢ় বাস্তবতা তথা শোষিত-পীড়িত মানুষের কাহিনী। পরের উপন্যাস 'মিছিল'(১৯২৮) এ বস্তি ও শ্রমিক জীবন থেকে সরে এসেছেন ঔপন্যাসিক, ধরতে চেয়েছেন সমকালীন শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ছবিটিকে। 'আগামীকাল'(১৯৩০) উপন্যাসটির বিষয়বস্তু আমাদের গৃহীত প্রকল্পটির পক্ষে বেশ মূল্যবান বলেই মনে হয়েছে। কলকাতা মহানগরী ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পল্লীপ্রায় শহর-প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলি শহরতলী নাম নিয়ে উঠে আসছে শহরের দিকে। একদিকে মহানগরের অঙ্গস্ফীতি,অন্যদিকে সেখানে বহুবিচিত্র মানুষের ভিড়, জীবন-জীবিকার নানাক্ষেত্রে নানা মানুষের আনাগোনা —মহানগরের এই আর্থ-সমাজ বাস্তবতাকে উপন্যাসে

ধারণ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তারাশঙ্কর বা মানিকের উপন্যাসে পরবর্তীকালে শহর-প্রান্তবর্তী পল্লীপ্রায় অঞ্চলের নগরায়নের ছবিটিকে আরও পরিস্ফুট হতে দেখা গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮—১৯৫৬)কে 'belated Kallolean' এবং তাঁর সাহিত্যরচনাকে 'of Kallol in spirit' বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে তিনি 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি বৈজ্ঞানিক সত্য-সন্ধিৎসার কঠিন ব্রত নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে আধুনিক বাঙালি জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধ ও প্রত্যয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগে উঠতে থাকে অনেক লেখকের মনে। কিন্তু, মানিকের অন্ত্যহীন জীবনজিজ্ঞাসা আসলে একেবারে কৈশোর জীবন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য লক্ষণ হিসেবেই স্বতোৎসারিত। জীবন সম্পর্কে তাঁর ছিল নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টি; জীবনের প্রতি তাঁর ছিল এক ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়। নরনারীর সম্পর্কের নিগূঢ় জটিলতার চিত্র রূপায়ণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। 'যৌনতা'কে তিনি জগদীশ গুপ্তের মতো অমোঘ, নির্মম নিয়তির প্রতীকে দেখেননি। তিনি এ বিষয়ে প্রধানত জোর দিয়েছেন মানুষের যৌনচেতনার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটির উপর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু, তথাকথিত ভদ্র, মধ্যবিত্ত জীবনকে নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে তাঁর চোখে ধরা পড়েছে এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, স্বার্থপরতা, বিকৃতি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুখ ও মুখোশ আলাদা হয়ে ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। আপাত মহৎ, আপাত ভদ্র মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের স্বরূপটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরে মানিকের শিল্পী-মন ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। 'মধ্যবিত্ত' জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে সতত উদীয়মান 'বাস্তব' জিজ্ঞাসার জবাব তিনি রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে খুঁজে পাননি। শরৎচন্দ্রের রচনা তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করলেও শরৎচন্দ্রীয় হৃদয়াবেগ ও ভাবালুতার আতিশয্য তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। মানিক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হলেও একেবারে তরুণ বয়স থেকেই তিনি এক ধরণের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতেন তথাকথিত নিম্নবিত্তের মাঝি-মাল্লার, চাষী-মজুর, হাড়ি-বাগ্‌দীদের রুক্ষ কঠোর জীবনাদর্শের সঙ্গে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে— একদিকে 'মধ্যবিত্ত' ও অন্যদিকে সমাজের নীচু স্তরের দরিদ্র মানুষের জীবন— এই উভয় স্তরের মানুষের জীবনের অসামঞ্জস্য ফুটিয়ে তোলাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান প্রধান উপন্যাসের অবলম্বন। তাঁর উপন্যাসে জমিদার, ব্যবসায়ী, সুদখোর মহাজন, অধ্যাপক, কেরানি, অভিনেতা, পাশকরা এবং হাতুড়ে ডাক্তার, অজস্র শ্রমজীবী মানুষের ভিড়। 'রিয়ালিজমে'র দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে মধ্যবিত্ত ও তথাকথিত নিম্নবিত্তশ্রেণির মানুষের জীবনের সত্যরূপ আবিষ্কার করার ব্রত—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসাবলীর প্রধান লক্ষণ। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের মতো মধ্যবিত্তসুলভ অভিমানকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। প্রশ্রয় দেননি বলেই 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র (১৯৩৬) শশী যেমন হয়ে উঠেছে ' তিরিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ'[২৪] তেমনি 'সহরতলী'(১৯৪০) উপন্যাসে যশোদার কণ্ঠে তথাকথিত 'ভদ্রলোকে'রা অত্যন্ত নির্মমভাবে সমালোচিত হয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক — এঁরা প্রত্যেকে যুগপতি হিসেবে পরিচিত। সমালোচক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় বাংলা উপন্যাসের যে ইতিহাস রচনা করেছেন, সেখানে যুগপতি লেখকদের স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দিয়ে অতঃপর ১৯৩০ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে বা তার দু'এক বছর আগে পরে যাঁরা ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন,তাঁদের 'উপন্যাসে নবযুগ' নামে একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি সর্বমোট ৩৮ জন ঔপন্যাসিকের নামোল্লেখ করেছেন। [২৫]

উল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের নামের তালিকাটি নিম্নরূপ — ১। জগদীশ গুপ্ত , ২। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৩। মনীন্দ্রলাল বসু, ৪। নজরুল ইসলাম, ৫। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৬। জীবনানন্দ দাশ, ৭। বনফুল, ৮। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, ৯। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১০। প্রমথনাথ বিশী, ১১। মনোজ বসু, ১২। সরোজকুমার রায় চৌধুরী, ১৩। গোপাল হালদার, ১৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ১৫। প্রেমেন্দ্র মিত্র, ১৬। অন্নদাশঙ্কর রায়, ১৭। জরাসন্ধ, ১৮। সৈয়দ মুজতবা আলি, ১৯। সতীনাথ ভাদুড়ী, ২০। প্রবোধকুমার সান্যাল, ২১। বুদ্ধদেব বসু, ২২। আশাপূর্ণা দেবী, ২৩। গজেন্দ্রকুমার মিত্র, ২৪। অবধূত, ২৫। সুবোধ ঘোষ, ২৬। বিমল মিত্র, ২৭। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ২৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৯। সন্তোষকুমার ঘোষ, ৩০। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩১। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৩২। বিমল কর, ৩৩। বাণী রায়, ৩৪। রমাপদ চৌধুরী, ৩৫। সমরেশ বসু, ৩৬। প্রতিভা বসু, ৩৭। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ৩৮। মহাশ্বেতা দেবী। তবে, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমাদের গৃহীত প্রকল্পটিতে যাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় অগ্রসর হতে চলেছি অর্থাৎ ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী—তাঁকে উপরিউক্ত তালিকায় সমালোচক ১৯৩০—'৬৫-র কালপর্বে ঠাঁই দিলেও, এ কথা ঠিক যে, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর (এই বিশেষ কালপর্বে ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও) ঔপন্যাসিক প্রতিভার চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছে ১৯৬৫-র পরে। আরেকটি বিষয় এখানে প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, উপরিউক্ত তালিকাবদ্ধ ঔপন্যাসিকদের ঔপন্যাসিক প্রতিভা যেমন সম মাপের নয়, তেমনি তাঁদের উপন্যাসের বিষয়বস্তুও পরস্পর ভিন্ন। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী মূলত শহুরে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। নানা কারণে তাঁর তুলনা চলতে পারে—তারাশঙ্কর, মানিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে। তারাশঙ্কর, মানিক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যবিত্ত জীবনদৃষ্টির প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এবার, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের পরিচয় সন্ধান করা যেতে পারে।

রমাপদ চৌধুরী যে সময়ে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন অজস্র খ্যাতিমান, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পেয়ে গেছেন বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা। লক্ষণীয়, রমাপদর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষের মতো লেখকেরা তখন বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই সময়ের মধ্যে তারাশঙ্করের ২৩টি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৯টি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ৫টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। অন্য আরও অনেকেই এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত লেখক। যদিও ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই বাংলা কথাসাহিত্যে রমাপদ চৌধুরীর আবির্ভাব, তবুও তিনি মনে প্রাণে চাইলেন ঔপন্যাসিক হয়ে উঠতে। কিন্তু, ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে প্রয়োজন নিজের স্বাতন্ত্র্য পাঠকদের চিনিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আজীবন সশ্রদ্ধ রমাপদর তখন মনে হয়েছে— " লিখতে শুরু করেছি যখন, তখন আমাদের সামনে দুটি পথ— তারাশঙ্কর আর সুবোধ ঘোষ।"[২৬] সময়ের পটভূমিতে— বহু মানুষের জীবন ও জীবিকার বহু বিচিত্র পথে আনাগোনা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মন্বন্তর' উপন্যাসে তারাশঙ্কর একবার মুখ ফেরালেন কলকাতা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের দিকে — " যে জটিলতা, যে দ্বন্দ্ব, যে ব্যর্থতাবোধ তাঁর গ্রামীণ মধ্যবিত্ত নায়কদের ক্ষেত্রে তিনি কল্পনায় আনতে পারেন না, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালীন দীর্ণতার পর, তারাশঙ্কর ভাবলেন, সেটা কলকাতায় হবে সহজলভ্য। 'মন্বন্তর' তাঁর সেই চেষ্টার প্রথম প্রকাশ।" [২৭] কিন্তু, বাস্তবে দেখা গেল, 'মন্বন্তর' উপন্যাসের নায়ক কানাইয়ের যন্ত্রণায় মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন জটিলতার তেমন সাক্ষ্য নেই। সমালোচকদের মতে, নগর-জীবনকে গভীর মনোনিবেশে কোথাও ধরেননি

তারাশঙ্কর। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর উপন্যাসে মূলত বস্তিবাসী ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণি-সমাজের এক নিখুঁত প্রতিভাস উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। কিন্তু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যবিত্ত চরিত্রেরা প্রায় সকলেই হয় গ্রামীণ মধ্যবিত্ত নয় শহরতলীর মধ্যবিত্ত।

অন্যদিকে, সুবোধ ঘোষ (১৯০৯—১৯৮০) নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার সুনিপুণ রূপকার। 'দেশ' পত্রিকার পক্ষ থেকে নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিমল কর জানিয়েছেন — " দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরবর্তীকালে যদি গল্পকার সুবোধ ঘোষের কথা ভাবা যায়, দেখা যাবে, তিনি এমন একজন শক্তিমান ও প্রভাব বিস্তারী লেখক যে, নতুন গল্পকারদের মধ্যে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা মুস্কিল।" [২৮] সুবোধ ঘোষের রচনায় বারবার উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থাহীনতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামির কথা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের 'বহুরূপী' চরিত্রটিকে বারবার তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'মানবিকতা' মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে আজ আর 'আদর্শ' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে না, পার্থিব জগতের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাফল্য—সবই বিবেচিত হচ্ছে 'টাকা'র মূল্যে। নতুন কালের মানসিকতা, প্রকৃত চেহারাটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবেই পরিবেশন করেছেন সুবোধ ঘোষ। ছোটগল্প রচনায় তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত, সংশয়ের ঊর্ধ্বে। 'অযান্ত্রিক', 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'গোত্রান্তর', 'সুন্দরম','চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' প্রভৃতি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। কিন্তু, কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা প্রধানত ছোটগল্প রচয়িতা হিসেবে। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে তিরিশটিরও বেশি উপন্যাস রচনা করলেও সবগুলি কিন্তু সমান জনপ্রিয়তা পায়নি এবং শিল্পরূপের দিক থেকেও সব উপন্যাস সার্থকতার চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করতে পারেনি। প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'তে (১৯৪৪) ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের আগ্রহই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে —

> প্রতিবেশ রচনার মধ্যে দুইটি স্তর আছে— প্রথমটি, মতবাদের বিতর্কমূলক ও দ্বিতীয়টি, দুর্ভিক্ষের সংস্কৃতিবিধ্বংসী, সভ্যতার মূলোচ্ছেদকারী,নিদারুণ বিচ্ছৃঙ্খলার বর্ণনা-বিষয়ক। তর্কবিতর্কে লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও যুক্তিবাদের পরিচয় মেলে—কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যিকের উদার অপক্ষপাতের একান্ত অভাব। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপদ্ধতিকে যে শানিত বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন,তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কুৎসা রটনা করিয়াছেন তাহার সপক্ষে তিনি কোন হেতো দেখান নাই। ... সমস্ত আলোচনাটি সাহিত্য অপেক্ষা প্রচার কার্যে সমধর্মী বলিয়া ঠেকে। [২৯]

ঔপন্যাসিক নিজেই তাঁর এই রাজনৈতিক পক্ষপাতের বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছেন —

> আমার প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' হলো জাতির জীবনের বেদনাক্রান্ত রূপ ও অবস্থার একটি প্রতিচ্ছবিত পরিচয়। উপন্যাসে ব্রিটিশরাজ ও কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ ও নীতির প্রতিবাদ আছে। জাতির স্বাধীনতার দাবী ও সংগ্রামের সমর্থন এবং প্রশস্তি আছে। সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টির মানুষ এবং যাঁরা পার্টির অনুগতজন, তাঁরা 'তিলাঞ্জলি'র প্রতি বিদ্বিষ্ট হবেন, এটা স্বাভাবিক। [৩০]

বস্তুত, 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি— এর চরিত্রগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত জীবনেও রাজনৈতিক আবেষ্টন থেকে মুক্ত হতে পারেনি। 'গঙ্গোত্রী'(১৯৪৭) উপন্যাসে রাজনীতি গৌণ, উপন্যাসের পটভূমিকা রচনার কার্যে নিয়োজিত হলেও উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের জীবনকাহিনী অনাবশ্যক জটিল হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, এই উপন্যাসটিও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসার স্বীকৃতি পায়নি —

> মাধুরী, বাসন্তী, কেশব, অজয়, সঞ্জীববাবু ও সারদা—ইহাদের জীবনকাহিনী অনাবশ্যকভাবে জটিল ও ঘাত-প্রতিঘাতের অহেতুক পৌনঃপুনিকতায় অস্পষ্ট ও আবিল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তি হিসাবে ইহাদের কোন

পরিচয় না দিয়াই হঠাৎ ইহাদের মধ্যে নানা সম্পর্ক-জটিলতার কল্পনা যেন ইন্দ্রজাল-প্রদর্শিত মায়াবৃক্ষে ফল ধরার মত মনে হয়।[৩১]

তবে, 'ত্রিযামা' লেখকের একটি অন্যতম সার্থক উপন্যাস। 'শ্রেয়সী' (১৯৫৭) উপন্যাসটি এক অভিজাত পরিবারের নৈতিক অবক্ষয়ের কাহিনী। এই উপন্যাসটিও পূর্ববর্তী উপন্যাসের তুলনায় অনেক বেশি সার্থক। যে উপন্যাসটি রচনার জন্য সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছেন সেটি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস 'শতকিয়া' (১৯৫৮)। সমালোচকদের মতে, 'শতকিয়া' সুবোধ ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২—১৯৮২) গল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেও 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষের স্নেহানুরোধে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী' (১৯৫২)। উপন্যাসটি সম্পর্কে স্বয়ং ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

একটা ছোট্ট মফঃস্বল শহর নিয়ে গল্প। সেখানে কিছু ভাল লোক ছিল, কিছু মন্দ লোক ছিল। তাদের লোভ হিংসা ছিল, কামনা বাসনা ছিল,যথেষ্ট স্নেহ মমতাও ছিল কারো কারো মধ্যে। এ-সব নিয়ে তারা বাঁচতে চেয়েছিল। সাধারণভাবে মানুষ যেভাবে বাঁচতে চায়। কোনো বড় আকাঙ্ক্ষা সাংঘাতিক স্বপ্ন তাদের চোখের সামনে ছিল না।[৩২]

'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'সূর্যমুখী'র ন্যায় এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর পটভূমি উঠে এসেছে লেখকের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধোত্তর বাঙালি জীবনের অবক্ষয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। লেখক অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাজ-ইতিহাসের বিষাদময় অধ্যায়টিকে বিবৃত করেছেন। উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন —

বারো ঘর লেখার আগে কিছুদিনের জন্য আমাকে এমন একটা বাড়িতে বাস করতে হয়েছিল। তা বলে সেখানে কে গুপ্তও ছিল না বা পাঁচু ভাদুড়ি, রমেশ, বিধু মাস্টার কি রুচি শিবনাথের মতন শিক্ষিত দম্পতিকেও আমি দেখিনি। কেবল একটা উঠোন ঘিরে বারোটা পরিবারকেই দেখেছিলাম। তার বেশি কিছু নয়। তবে আমার তখন মনে হল উপন্যাসের কাঠামো হিসেবে বহু পরিবারবিশিষ্ট এমন একটা আস্তানা মন্দ হয় না। হ্যাঁ, শুধু কাঠামোটাই কাজে লাগিয়েছিলাম। তারপর মগজ হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে কে গুপ্ত , শিবনাথ, রুচি, রমেশ, বেবি,অমল চাকলাদার, কমলা নার্স, পারিজাত ও প্রীতি বীথিকে উদ্ধার করেছিলাম। তার অর্থ কি। আজ থেকে কুড়ি বাইশ বছর আগে, তখন আমার বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ, তখনই আমি বারো ঘর লিখি, আর আমার এই স্বল্পপরিসর জীবনেই সমাজের কোনো না কোনো স্তরে, কোনো না কোনো সময়, সেটা আমার মফঃস্বল জীবনেও হতে পারে, বা কলকাতার মেছুয়াবাজারের বাড়ি, দর্জিপাড়ার বাসা কি শ্যামবাজারের আস্তানায় থাকার সময় আমার আশে পাশে এমন সব চরিত্র ঘোরাফেরা করতে আমি দেখেছিলাম। ... আমি স্বীকার করছি। আলো দেখাবার জন্য উত্তরণ দেখাবার জন্য এ-বই লিখিনি। কেননা আমার দেখা ও জানা চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটি মানুষও ছিল না, যে এদের মধ্যে উপস্থিত থেকে মহৎ জীবনাদর্শের বাণী শোনাতে পারত। বিপন্ন বিপর্যস্ত অবক্ষয়িত সমাজের মানুষগুলি শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কোনোরকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা অন্ধকারে, কতটা নিচে নেমে যেতে পারে আমি তাই দেখিয়েছি। আলো বা উত্তরণের পথে এদের নিয়ে যেতে হলে আমাকে আর এক ভল্যুম বারো ঘর লিখতে হত। এবং তখন সেটা বারো ঘরের কথা না হয়ে আমার কথা হত। কেননা আমি যে-সব চরিত্র দেখেছিলাম, তারা জীবিকার অন্বেষণ, খাওয়া ঘুম মৈথুন সন্তান উৎপাদন ও পরস্ত্রীর দিকে কামার্ত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করত না, এর অতিরিক্ত কোনোদিনই তারা কিছু করে না। ... তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম যে না ছিল এমন নয়। যেমন রুচি ও শিবনাথ। তারা নিজেদের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে দেবে কেন। চিরকালের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষদের মতন আলোর দিকে হাত বাড়াবার সুবুদ্ধি ও

বিচক্ষণতা তাদের ছিল। ... যেন সুখ সচ্ছলতার উষ্ণতা গায়ে মেখে শীতের সকালের মৌমাছির মতন সৌভাগ্যের রোদ্দুরে পাখা মেলে দেবার জন্য দুজন নিয়ত উসখুস করছে।[৩৩]

'সূর্যমুখী' বা 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীদেরও জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হ'ল কোনোক্রমে টিকে থাকা, বেঁচে থাকা। বড় কোনো স্বপ্ন বা আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে বিশেষ নেই বললেই চলে। 'বারো ঘর এক উঠোন' নামকরণের মধ্যে বাঙালির বারোয়ারী জীবনের ইঙ্গিত এক শোচনীয় ট্রাজেডিরই ইশারা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬—১৯৭৫) জন্মেছিলেন অধুনা পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার সদরদি নামক একটি পল্লীগ্রামে। পরে তিনি কলকাতায় আসেন। জন্মভূমির পরিবেশ-প্রতিবেশ তাঁর লেখায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি তাঁর 'আত্মকথা'য় লিখেছেন —

বৃহৎ গ্রাম ছিল আমাদের সদরদি। শুনেছি সদরদি একটি গ্রাম নয়। বাইশটি গ্রামের একটি মৌজা। কিন্তু ছেলেবেলায় আমাদের আনাগোনা ছিল একটি পাড়ার মধ্যেই। সেই পাড়ায় নানা জাতের বাস। চাষী মুসলমান যেমন ছিল তেমনি ছিল ধোপা নাপিত কামার কুমার, ব্যবসায়ী সাহা-সম্প্রদায়, জেলে জোলা আরো বহু রকমের বৃত্তিজীবী। এদের প্রতিটি ব্যক্তি, কি প্রতিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা নয়। কিন্তু এই পটভূমি কখনো জ্ঞাতসারে কি কখনো অজ্ঞাতে আমার চিত্তভূমিকে এক বিশেষ ধরণের রূপবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৩৪]

ঔপন্যাসিক নিজে ছিলেন একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান। তাই একান্নবর্তী পরিবারের কথা তাঁর রচনায় বারবার উঠে আসতে দেখি। সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণামূলে শুধু নেতিবাদের একাধিপত্য তিনি কখনই মেনে নিতে পারেননি— " যা অস্মিতাসূচক যা সদ্ভাববাচক বাল্যে কৈশোরে তাও কি আমি প্রচুরভাবে দু হাত ভরে পাইনি? একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুরমা, মা, জেঠীমা, কাকীমাদের স্নেহ, সযত্ন মনোযোগ কি আমার চারদিক ঘিরে থাকেনি?"[৩৫] সঙ্গত কারণেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে লেখকের গ্রামীণ সত্তা এবং একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, সর্বোপরি ভাঙনের চিত্র অনায়াস রূপ পেয়ে যায়। এযাবৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চান্নটি। তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত ও জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হ'ল — 'দ্বীপপুঞ্জ'(১৯৪৭), 'দেহমন'(১৯৫২), 'দূরভাষিণী'(১৯৫২), 'চেনা মহল'(১৯৫১—'৫২)। 'দ্বীপপুঞ্জ' লেখকের প্রথম উপন্যাস। এটি 'হরিবংশ' নামে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪২-৪৩ সময়কালে। 'দ্বীপপুঞ্জ'-র পটভূমি গ্রাম। লেখকের জন্মস্থান সদরদি গ্রামের অনেকেই ভিড় করে আছে এই উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটি পল্লীজীবনের ছোটখাটো সমস্যা, হৃদয়সংঘাতের এক মনোজ্ঞ ও বাস্তবানুসারী চিত্র। 'দেহমন' উপন্যাসে অবাধ যৌন সম্পর্কে আস্থাশীল, দেহসৌন্দর্যের বিনিময়ে ভোগবিলাসতৃপ্তির জন্য উৎসুক আধুনিক এক তরুণীর জীবনদর্শন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নারীপ্রগতির একটি বিশেষ তত্ত্বকে রূপায়িত করে তোলাই লেখকের অভিপ্রায়। 'দূরভাষিণী' টেলিফোনের অফিসে কর্মরতা মেয়েদের জীবন-কাহিনী ও হৃদয়চর্চার কাহিনী। উপন্যাসে এই মেয়েদের যে সমস্যা—তা চাকুরি করা যেকোনো মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মেয়েদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। মধ্যবিত্ত সংসারে দারিদ্র্যের কারণে, অনভ্যস্ত জীবনে বাঁধা পড়ে যায় এই উপন্যাসের মেয়েদের জীবন। কিন্তু, তাদের হৃদয়ও একসময় আকুল হয়ে ওঠে ভালোবাসার জন্য। অথচ— ট্রাজেডি এখানেই যে, যান্ত্রিক কর্তব্য পালন করতে করতে তাদের হৃদয়ের যাবতীয় আবেগের সরসতা ক্রমশ শুকিয়ে যায়। ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস 'চেনামহল'। প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ'-র পটভূমি গ্রাম; আর এই উপন্যাসটির পটভূমিকায় রয়েছে নাগরিক জীবন। লেখকের কথায় — "চেনা মহলের বহু চরিত্রের সঙ্গে কলকাতার আমার একটি বৃহৎ আত্মীয় পরিবারের অনেকের মিল দেখা যায়।"[৩৬] কিন্তু, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'চেনামহল'-এর পটভূমি কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকার একটি বাড়ি হলেও এর পাত্র-পাত্রীরা গ্রামছাড়া-শহুরে, চাকরি বা বৃত্তির

কারণেই তারা এক প্রজন্মের শহরবাসী। সুতরাং, 'চেনা মহল'-এর বাসিন্দারা কলকাতার ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা, চাকুরি-নির্ভর, গ্রাম থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত মানুষ। সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁর 'চেনা মহল' উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে জানিয়েছেন —

> খানিকটা শরৎচন্দ্রের মতো, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত এলাকাটাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিজের এলাকা, আপন মহল...ঔপনিবেশিক শিক্ষা নরেন্দ্রনাথকে খুব বেশি ছিন্নমূল করতে পারেনি। বাল্য ও কৈশোরের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে কখনোই ভোলেননি ... শরৎচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন গল্পে বা নভেলেটে এঁকেছেন পুরনো যৌথতার ভাঙনের ছবি, নরেন্দ্রনাথ তাঁর চেনামহলে এঁকেছেন নতুন— এবং কিছুটা আশু-প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে গ'ড়ে-তোলা নড়্বড়ে ও সাময়িক যৌথতার ভাঙনের ছবি ... কালাতিক্রান্ত যৌথ-পরিবারের বিধি-ব্যবস্থা যে ভিতরে ভিতরে পচে গিয়েছে, চেনামহল থেকে তা বেশ আন্দাজ করা যায়। [৩৭]

'চেনা মহলে'র ভুবনময়ী মনে প্রাণে চেয়েছিলেন পরিবারকে একসূত্রে বেঁধে রাখতে। মহানগরীর চেনা মহলে পারিবারিক স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবনকে সহজভাবে উপভোগ করবার যে বাসনা ছিল গ্রাম থেকে উঠে আসা এই ছিন্নমূল মানুষদের, ক্রমশ নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ হবার সাথে সাথে তাদের সেই ঈপ্সিত সুখকর স্বপ্নের জগৎ একসময় ভেঙে যায়। পারিবারিক যৌথতার ভাঙনই 'চেনা মহল'এর মূল সুর। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে শহর কলকাতার নাগরিক জীবনের বদলে যাওয়া ছবিটিকে যাঁরা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম।

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২১—১৯৮৫) বাংলা উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ ঔপন্যাসিকদেরই উত্তরাধিকারী। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি'(১৯৫০) কলকাতার জীর্ণ, সরু, আলোবাতাসহীন গলির অধিবাসীদের জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার কাহিনী। উপন্যাসটির প্রধান অবলম্বন নিম্ন-মধ্যবিত্ত বিকলাঙ্গ নাগরিক জীবন। বস্তুত, যেখানে বস্তিজীবনের প্রধান বাস্তবতাই হ'ল দারিদ্র ও দারিদ্র্য-সঞ্জাত চরিত্র বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের কাহিনীই সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন অনায়াস দক্ষতায়।

বিমল কর ও সন্তোষকুমার ঘোষ জন্মেছেন একই বছরে। বয়সে তাঁরা দুজনেই রমাপদর এক বছরের বড়। বিমল কর মূলত শিল্পাঞ্চলের লোক। পিতৃপুরুষদের বদলীর চাকুরির কারণে বাংলা এবং বাংলার বাইরে নানা জায়গায় থাকতে হয়েছে। বাবা-কাকারা যে যাঁর কর্মস্থলে থাকলেও তাঁদের পরিবারের গড়নটি ছিল অনেকটা একান্নবর্তী পরিবারের মতো— আর ধরণটি ছিল মধ্যবিত্তের। বিমল করের বাবা ছিলেন খানিকটা শৌখিন প্রকৃতির মানুষ। সাহিত্যানুরাগ তাঁর বিশেষ ছিল না বললেই চলে। বিমল কর সাহিত্য রচনার কিছুটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন কাকাদের কাছ থেকে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মত গ্রামীণ সত্তা তাঁর ছিলনা। বিমল কর নিজেই তাঁর সাহিত্য রচনার মূল প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে —

> আমার পারিবারিক জীবন থেকেই হয়তো অনুমান করা যাবে, আমার মন কোনো নির্দিষ্ট জলে-স্থলে আবদ্ধ হয়নি, কোথাও শিকড় গেড়ে বসেনি। ষোলো আনা বাঙালীয়ানা, বিশেষ করে সে-যুগের বঙ্গদেশীয় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক সংস্কার, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা আমায় পেয়ে বসেনি। যে বাংলাদেশ,বাংলার জল-বাতাস , মানুষ, তাদের ক্রিয়াকর্ম অনেক বাঙালী সাহিত্যিকের উপজীব্য হয়েছে , দুঃখের বিষয় আমার তা হয়নি। আমি একটিও বাংলার গ্রাম্যচিত্র রচনা করতে পারিনি। আমি হয় শহুরে মানুষের কথা লিখেছি, না হয় বাংলার বাইরের কোনো জনপদের। [৩৮]

বাংলা উপন্যাসে বিমল কর মিশ্র সংস্কৃতির উপাসক এবং শেষের দিকে তিনি মানুষের অবচেতন মন নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সমালোচকদের মতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'দেওয়াল'। দ্বিতীয়

বিশ্বমহাযুদ্ধ সারা পৃথিবীতে যে হিংসা, যে অস্থিরতা, বিশ্বাসবোধের অপমৃত্যু মানুষের মনে প্রোথিত করে তুলেছিল, তার ঢেউ কীভাবে কলকাতার নাগরিক জীবনে আছড়ে পড়েছে তারই বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটিতে। 'দেওয়াল'-ত্রয়ী উপন্যাসটির পটভূমি সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন —

> দেওয়াল' উপন্যাস লেখার একটা সুপ্ত বাসনা আমার অনেকদিন ধরেই ছিল। বোধহয় বেনারসে থাকার সময় এ-রকম একটা খেয়াল মাথায় এসেছিল। 'এ রুম ইন্ বার্লিন' নামে একটি উপন্যাস পড়েছিলাম তখন, কার লেখা তা মনে নেই আর। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বার্লিন শহরের একটি দরিদ্র পরিবার কিভাবে সর্বদিক থেকে অধঃপতিত হল তার কথাই ছিল উপন্যাসটির বক্তব্য। এখন ওই বইটি সম্পর্কে আমার কিছুই মনে নেই। যাই হোক, ওই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি আমার মনের দিক থেকে বেশ আলোড়িত করেছিল তখন। ভাবতাম, এ-রকম একটি উপন্যাস আমাদের এখানেও লেখা যায়। শহর কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন ও অবক্ষয় নিশ্চয়ই একটি বিষয় হতে পারে উপন্যাসের। [৩৯]

বস্তুত, বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাসে আধুনিক যুগের কলকাতার নাগরিক গার্হস্থ্য জীবনছন্দ কেমন করে যুদ্ধ, বোমার আতঙ্ক, জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা, দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। লেখকের 'মল্লিকা'(১৯৬০) উপন্যাসে আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে অর্থকৃচ্ছ্রতা ও মিথ্যা সম্ভ্রমবোধ যে সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কের পথেও অন্তরায় হয়ে উঠেছে — এই বিশেষ দিকটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন অবলম্বনে রচিত উপন্যাসের সংখ্যা সুপ্রচুর। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ—প্রমুখ গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের উত্তরাধিকার আপন চেতনায় ধারণ করে, বিশ্বমহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিলেন—কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের রূপকার হিসেবে। বাংলা উপন্যাসে রমাপদ চৌধুরীই একমাত্র লেখক, যিনি ১৯৫৪ থেকে শুরু করে ২০০৪ পর্যন্ত সুদীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিটিকে চলমান সময়ের পটভূমিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সুদীর্ঘ কালপ্রবাহের মধ্যে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সতত পরিবর্তনশীল জীবন ও জীবন-ভাবনাটিকে যে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন রমাপদ, তাঁর সমসাময়িক কালে আভির্ভূত আর কোনো লেখককে এমন অভিনিবিষ্ট থাকতে দেখা যায়নি। রমাপদর উপন্যাস এক বিস্তৃত সময়ের পটভূমিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের এক অভ্রান্ত দলিল। তাঁর মধ্যবিত্ত জীবন নির্ভর উপন্যাসগুলি শুধু উপন্যাস হিসেবেই নয়, সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছেও হয়ে উঠতে পারে এক পরম আকর্ষণের বিষয়।

নির্দেশিকা —

১. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩)— সুকুমার সেন। প্রথম আনন্দ সংস্করণ। দ্বিতীয় মুদ্রণ- কার্তিক, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ১৬৫।

২. 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর'— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৮৮। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—৪৮।

৩. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'(৩)—সুকুমার সেন। প্রথম আনন্দ সংস্করণ। দ্বিতীয় মুদ্রণ—কার্তিক, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ২০১।

৪. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ—২০০৪। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি.। কলকাতা — ৭৩। পৃষ্ঠা — ৫৯।

৫. 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সং—ডিসেম্বর,১৯৮৮। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা— ৪৮।

৬. 'রবীন্দ্র উপন্যাস,তার আধুনিকতা', আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস— অশ্রুকুমার সিকদার। তৃতীয় পরিমার্জিত সং—মার্চ, ২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা—৬। পৃষ্ঠা—১।

৭. তদেব। পৃষ্ঠা—১।

৮. 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা'— সত্যেন্দ্রনাথ রায়। প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী,২০০০। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১২৯।

৯. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ—২০০৪। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি.। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—২২৩।

১০. 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'— অশ্রুকুমার সিকদার। তৃতীয় পরিমার্জিত সং, মার্চ, ২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা—৬। পৃষ্ঠা—৩৩।

১১. 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর'—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সং—ডিসেম্বর,১৯৮৮। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—২১৬-'১৭।

১২. 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'—অশ্রুকুমার সিকদার। তৃতীয় পরিমার্জিত সং—মার্চ,২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা—৬। পৃষ্ঠা—৩৯-৪০।

১৩. তদেব। পৃষ্ঠা—৪০।

১৪. তদেব। পৃষ্ঠা—৪৫।

১৫. 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা'—সত্যেন্দ্রনাথ রায়। প্রথম সং—জানুয়ারী,২০০০। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১৫৯-৬০।

১৬. 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'—অশ্রুকুমার সিকদার। তৃতীয় পরিমার্জিত সং—মার্চ,২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা—৬। পৃষ্ঠা—৪৬।

১৭. 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের এই অংশটুকু নেওয়া হয়েছে 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে। লেখক— ডঃ রামেশ্বর শ'। প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারী,২০০৬। পুস্তক বিপণি। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৫৩।

১৮. তদেব। পৃষ্ঠা—৬১।

১৯. 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর'—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সং—ডিসেম্বর, ১৯৮৮। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা— ২৯৬।

২০. 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'— অশ্রুকমার সিকদার। তৃতীয় পরিমার্জিত সং—মার্চ,২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা—৬। পৃষ্ঠা—১০০।

২১. 'আরণ্যক'—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দশম মুদ্রণ— পৌষ,১৪০০বঙ্গাব্দ। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.। কলকাতা— ৭৩। পৃষ্ঠা—৫৮-৫৯।

২২. তদেব। পৃষ্ঠা—১২।

২৩. 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। তৃতীয় সং— আগস্ট,২০১০। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—২৮৮।
২৪. 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর'—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সং—ডিসেম্বর,১৯৮৮। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা— ৩৩৩।
২৫. 'উপন্যাসের ইতিহাস'(৪)— ক্ষেত্র গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ—২০০২। গ্রন্থনিলয়। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৭-৮।
২৬. 'লেখালেখি',গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী,২০১১। এবং মুশায়েরা। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১৭০।
২৭. 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর'— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সং—ডিসেম্বর,১৯৮৮। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—৩১৭।
২৮. ' সাক্ষাৎকার', বিমল কর। দেশ পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি। কলকাতা—১। ৩রা নভেম্বর, ১৯৯১। পৃষ্ঠা—৫৭।
২৯. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ—২০০৪। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি.। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—৬৫৫।
৩০. 'সেদিনের আলোছায়া'—সুবোধ ঘোষ। দেশ সাহিত্য সংখ্যা—১৩৮২ বঙ্গাব্দ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি.। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা—৫২।
৩১. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ—২০০৪। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি.। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা— ৬৫৭।
৩২. ' আমার সাহিত্য জীবন আমার উপন্যাস'—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। দেশ সাহিত্য সংখ্যা—১৩৮২ বঙ্গাব্দ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি.। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা—১০৭।
৩৩. তদেব। পৃষ্ঠা— ১০৮।
৩৪. 'আত্মকথা'- নরেন্দ্রনাথ মিত্র। দেশ সাহিত্য সংখ্যা—১৩৮২বঙ্গাব্দ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা—১০৯।
৩৫. তদেব। পৃষ্ঠা—১১০।
৩৬. তদেব। পৃষ্ঠা—১১৮।
৩৭. 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা'—সত্যেন্দ্রনাথ রায়। প্রথম সং— জানুয়ারী,২০০০। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—২৬৮-২৭১।
৩৮. 'আমার লেখা'—বিমল কর। দেশ সাহিত্য সংখ্যা—১৩৮২বঙ্গাব্দ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি.। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা—১৪৩।
৩৯. তদেব। পৃষ্ঠা—১৪৭।